৭
শিক্ষা কমিশন

ভাইস চান্সেলর হবার পরপরই আমার উপর একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। একটা শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে সংশোধিত করা যায় সে সম্বন্ধে সুপারিশ করতে বলা হয়। আমি ছিলাম–এর চেয়ারম্যান। সদস্য ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী, ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর মুহম্মদ আবদুল বারী (তিনি রাজশাহীতে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন) এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সাইফ উদ্দীন জোয়ারদার। আমরা বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করি। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রধান প্রধান সুপারিশ ছিলো এই যে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পর্যায় পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত হতে হবে। আমরা শিক্ষা কাঠামোতে নীচের দিকে কোনো বড় রকমের কথা বলিনি কারণ কাঠামো নিয়ে টানাটানির ফলে আইয়ুব খান আমলের শরিফ কমিশন ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ইউনিভার্সিটি শিক্ষা সম্পর্কে একটা সুপারিশ করতে বাধ্য হয়েছিলাম যার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। আমি আগে উল্লেখ করেছি যে আমি ঢাকা

ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং আমরা যারা ঢাকা থেকে তিন বছর মেয়াদের অনার্স কোর্স নিয়ে পাস করেছি তাদের বিশ্বাস ছিলো যে ঢাকার শিক্ষা ব্যবস্থা কোলকাতার শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত। কোলকাতার পাস এবং অনার্সের মধ্যে মেয়াদের দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই। আমি যখন ১৯৪৪ সালে ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করি তখনই প্রথম এই তথ্য আবিষ্কার করি। যে সব ছাত্র কোনো বিষয়ে অনার্স করতে চাইতো তারা ঐ বিষয়ে পাস কোর্সে তিন পেপারের বদলে ছয় পেপার নিয়ে পরীক্ষা দিতো। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনার্স থেকে পাসে আসবার এখতিয়ার তাদের থাকতো। অর্থাৎ অনার্স ডিগ্রী নিতে হলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে থাকতো ছাত্রের উপর। ঢাকায় যে ব্যবস্থা কায়েম ছিলো তাতে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হবার পর সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার চিন্তা ছিলো না। সেকেন্ড ইয়ারের শেষে সাবসিডিয়ারি বিষয়ে পরীক্ষা হলেও পঞ্চাশের দশক থেকে এতে অতি মাত্রায় রাজনীতি প্রশ্রয় পেতো। যেহেতু অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষার আগেই শুধু একটু পড়াশুনার চেষ্টা করতো। প্রথম দু'বছর তারা সময়ের অপচয় করে শিক্ষা বহির্ভূত নানা কাজে লিপ্ত হয়ে যেতো। এ কথা ভেবে আমরা সুপারিশ করি যে তিন বছরের অনার্স কোর্স তুলে দিয়ে কোলকাতার মতো অনার্স প্রবর্তন করা হোক। যে ছাত্র অনার্স ডিগ্রী নেবে সে যেনো উপলব্ধি করে যে তাকে অতিরিক্ত খাটুনি করে এ ডিগ্রী অর্জন করতে হবে।

তাছাড়া আর একটি দিকের কথা ভেবেও আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। ঢাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯২১ সালে প্রবর্তিত হয়েছিলো সেটা ৬০–এর দশকে এসে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ঢাকাতে অক্সফোর্ড এর মডেলে আবাসিক ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়েছিলো। যদিও কিছু ছাত্র প্রথমাবধি বাইরে থেকে পড়াশুনা করতো, কথা ছিলো যে ছাত্রদের হলে থাকতে হবে। ১৯২১ সালে যখন ক্লাস খোলা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে ৩টি হলও প্রতিষ্ঠিত হয়– সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল এবং ঢাকা হল। সলিমুল্লাহ হলে থাকতো মুসলমান ছাত্রেরা, জগন্নাথ হল ছিলো হিন্দু ছাত্রদের জন্য, আর ঢাকা হলে সব সম্প্রদায়ের থাকবার ব্যবস্থা ছিলো, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে ৫০–এর দশকের আগে ঢাকা হলে কোনো মুসলমান ছেলেকে ভর্তি করা প্রয়োজন ঘটেনি। হলে কড়া ডিসিপিলিন রক্ষা করা হতো। ছাত্রেরা দু'বেলা হলের ডাইনিং হলে একত্রে আহার করতো এবং রাত্রে হাউজ টিউটররা একবার করে সবার রোল কল করতেন। ৫০ দশকের দিকে ডাইনিং হল ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ছাত্রেরা হলের মধ্যে মেস করে স্বাধীনভাবে রান্নাবান্না করার ব্যবস্থা করে। রাত্রের রোলকল পরিণত হয় একটা প্রহসনে। ছাত্ররা কে কখন হলে ফিরে আসতো তার উপর নজর রাখা হল কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমরা যে আমলে পড়াশুনা করেছি তখন অনার্স এবং এম এ-তে টিউটোরিয়াল গ্রুপে দুই জনের বেশী ছাত্র রাখা হতো না। ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে কখনো তিন চার জন পর্যন্ত ছাত্রকে

এক গ্রুপে ভর্তি করা হতো। সাবসিডিয়ারি বিষয়েও টিউটোরিয়াল-এর ব্যবস্থা ছিলো। ষাটের দশকে এসে সংখ্যাধিক্যের কারণে সাবসিডিয়ারিতে টিউটোরিয়াল তুলে দিতে হয়। এবং অনার্স ও এম এ-তে প্রতি গ্রুপে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে ৮/১০ জন করে।

এর ফল দাঁড়িয়েছিলো এই যে ঢাকার শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যে পরিবেশের কথা ভেবে ঢাকায় আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার চরিত্র একেবারে বদলে গিয়েছিলো। আবাসিক ছাত্রের অনুপাতে অনাবাসিক ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। আরো অনাচার শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে। শুনেছি ছাত্রেরা বাইরের লোকের কাছে নিজের সিট ভাড়া দিয়ে দু'পয়সা অর্জনের চেষ্টা করতো।

এ সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে আমাদের মনে হয়েছিলো যে, যেহেতু পুরানো আবাসিক আদর্শ সমুন্নত রাখতে হলে যা করণীয় তা করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত করা সমীচীন।

এখন শুনছি যে অনেক ছাত্র বিশেষ করে ছাত্রী নিজের কামরায় হিটার দিয়ে রান্নাবান্না করে খায় এতে হলের কর্তৃপক্ষ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। ডাইনিং হল ব্যবস্থা প্রায় উঠে গেছে।

যাক, আমাদের সুপারিশ কার্যকরি হওয়ার অনেক আগেই পূর্ব পাকিস্তানের পতনের ফলে ওগুলো অকেজো হয়ে যায়। সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্টের কোনো কপিও রাখতে পারিনি।

মালেক ক্যাবিনেট

এ সময় ডক্টর মালেকের ক্যাবিনেটে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আব্বাস আলী খান। তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর। তাঁর সঙ্গে খুব সম্ভব দু'বার আমার সরকারী কাজে দেখা হয়। মালেক ক্যাবিনেটে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আব্বাস আলী খানের মতো অনভিজ্ঞ ছিলেন। ডক্টর মালেক ইচ্ছা করেই এমন সব লোক বাছাই করে নিয়েছিলেন যাঁরা আগে কখনো কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেননি। ডক্টর মালেক বলতেন, যাতে লোকে এদের অতীত কার্যকলাপ নিয়ে কোনো সমালোচনা না করতে পারে সেজন্য আমি অভিজ্ঞতার কথা না ভেবে শুধু চরিত্রবান ব্যক্তিদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করেছি। মুশকিল হলো এদের অধিকাংশই ছিলেন একেবারে অপরিচিত।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যতোই নিষ্কলঙ্ক হোন না কেন জনগণের মনে তাঁরা বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। এঁদের আন্তরিকতা ছিলো কিন্তু

সংকটকালে শুধু আন্তরিকতা দিয়ে কাজ হয়নি। যে পরিচয় থাকলে তাঁরা লোকের মনে একটা আবেদন জাগাতে পারতেন সে পরিচয় ছিলো শুধু গবর্নর মালেকের। কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিলো ঠ্যাটা মালেক। কারণ নিজের বিবেকের কাছে যা সত্য বলে মনে হয়েছে রাজনীতির খাতিরে তার হেরফের তিনি করতে দেননি। আগেই বলেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নানা ভুলের কারণে অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, মিলিটারির ক্ষেত্রেও। আমরা তখন প্রায়ই শুনতাম পূর্ব পাকিস্তানে ইন্ডিয়ান আর্মির অনুপ্রবেশের কথা। কিন্তু পাকিস্তান সর্বত্রই আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করে চলে। ভারতের চাপ যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে আর্মি ততোই বর্ডার থেকে সরে আসে। এটা কোন্ ধরনের স্ট্রাটেজি ছিলো সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া পাকিস্তান আর্মি অনেকগুলো সেক্টরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় অনেকটা শক্তিহীন হয়ে যায় বলে আমার ধারণা হতো।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয়বার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে যারা পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের দেশে ফিরে আসতে আহ্বান জানান। কিন্তু এতে বিশেষ কাজ হয়েছিলো বলে মনে হয় না। ইয়াহিয়া খান আরো ঘোষণা করেন যে, ন্যাশনাল এসেম্বলির যে সমস্ত সদস্য দেশ ত্যাগ করে চলে গেছেন তাদের আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে এবং এসব আসনের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। যদ্দুর মনে পড়ে নবেম্বর মাসে বা তার আগেই এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নতুনভাবে ন্যাশনাল এসেম্বলির অধিবেশনের কথাও ঘোষণা করেন। এই অধিবেশন হবার কথা ছিলো ডিসেম্বরে কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের বিপর্যয়ের ফলে এ ব্যবস্থা ভন্ডুল হয়ে যায়। নবেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল সদস্য ইসলামাবাদ যান তাঁরা আটকা পড়েন।

ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক বুদ্ধি-শুদ্ধি সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা ছিলো না। উল্লেখ করা বোধ হয় প্রয়োজন যে, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের আর্মির মধ্যে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করে তিনি ক্ষমতা অধিকার করেন। আইয়ুব খান এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবার চেষ্টা না করে নীরবে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ছিলেন এয়ারফোর্স চিফ নূর খান এবং নেভির চিফ আহসান (ইনি পরে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর নিযুক্ত হন)। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট এবং চিফ মার্শাল ল' এডমিনিসটেটর-এর পদ গ্রহণ করেন। নূর খান পেয়েছিলেন শিক্ষা এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের কার্যভার। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এক কর্মসূচী প্রকাশ করেন। সেটা পাঠ করে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। তার মধ্যে এমন সব উদ্ভট কথা ছিলো যাতে বোঝা যায় যে, নূর খান এবং তার সহযোগী কর্মচারী যারা এই

কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাঁদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিলো না। নূর খান চেয়েছিলেন কিছু সস্তা শ্লোগান দিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয় হতে। আমি এই কর্মসূচীর দু-একটি দিকের উল্লেখ করছি- এতে ঘোষণা করা হয় যে আগামী কয়েক বছরে দেশে ক'জন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের দরকার। এর পেছনে কোনো যুক্তি দেখানো হয়নি, জনসংখ্যার উল্লেখ ছিলো না, খেয়াল-খুশী মতো একটা সংখ্যা বসিয়ে এঁরা দেখাতে চাইলেন যে তাঁরা দেশকে কত দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চান। এর সঙ্গে ছিলো আর এক সিদ্ধান্ত। কর্মসূচীতে বলা হয় যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল গণতান্ত্রিকায়ন করে প্রত্যেক স্তরেই ছাত্রদের প্রতিনিধি রাখা হবে। এবং সিলেবাস কি হবে সেটাও স্থির করতে হবে ছাত্রদের পরামর্শ মতো। কারণ গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ক্ষমতা।

নূর খান

আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে নূর খান ছাত্রদের খুশী করতে চান। তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে ছাত্ররা পাঠক্রম নির্বাচন করবে কোন্ অভিজ্ঞতার জোরে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষ অর্থাৎ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কে কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করবে সে স্বাধীনতা বর্তমান ব্যবস্থায় রয়েছে কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে বিজ্ঞানের কোন্ সূত্রটি বা সাহিত্যের কোন্ পুস্তকটি পাঠ করতে হবে তা নির্ধারণের স্বাধীনতা ছাত্রদের দিতে হবে তা হলে শিক্ষা কথাটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন নূর খান বললেন যে, এই স্বাধীনতা প্রাইমারী স্কুলের শিশুদেরও দিতে হবে। এরপর আমি মনে করি যে এ লোকের সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। যিনি মনে করতে পারেন যে পাঁচ ছ' বছরের শিশুও কি পড়বে বা পড়বে না তা স্থির করবে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে কি ফল হবে। আমি এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে লিখিতভাবে আমাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে তাঁরই সরকারের নামে নূর খান যে শিক্ষা কর্মসূচী প্রকাশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করতে গেলে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে। এতে ফল হয়েছিলো বলে মনে হয়। এর কিছুকাল পর ইয়াহিয়া খান যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন তখন আমরা কয়েকজন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। নূর খানের শিক্ষা কর্মসূচীর উল্লেখ করা মাত্র তিনি বলে উঠলেন এর সঙ্গে আমার সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হলাম কিন্তু অবাকও।

এ তো গেলো শিক্ষা ক্ষেত্রের কথা। অন্যদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে তাঁর সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং তিনি যথাশীঘ্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী। এই

প্রতিনিধিরা দেশের নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবেন। তারপর যে কান্ডটি তিনি করেন তার সঙ্গে তাঁর ঘোষণার সঙ্গতি ছিলো না। এলএফও (লীগাল ফেমওয়ার্ক অর্ডার) নামক এক ঘোষণা পত্রে কার্যতঃ সাংবিধানিক সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট হয়। এরপর গণ পরিষদের করণীয় বিশেষ কিছু ছিলো না। প্রথমত ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জাতীয় পরিষদ ১৯৫৬ সাল থেকে সংখ্যা সাম্যের যে নীতি অনুসৃত হচ্ছিলো সেটা বাতিল হয়ে যায়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু লোক খুশী হয়েছিলেন। তাঁরা তখন ক্ষমতার লোভে এ প্রশ্নও তোলেননি যে এ রকম একটি পরিবর্তন করার অধিকার শুধু গণ পরিষদেরই থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে যে ব্যবস্থায় এক ইউনিটে পরিণত করা হয়েছিলো সেটাও তিনি বাতিল করেন। তারপর আরো মজার কথা যে একদিকে তিনি বলেছিলেন যে, সব দল অবাধে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। অন্যদিকে কোনো রকমের তদন্ত না করে এবং বিশ্বাসযোগ্য কোনো কারণ না দেখিয়ে মুসলিম লীগের ফান্ড ফ্রিজ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রকাশ্য দহরম মহরম করে ইয়াহিয়া খান বুঝাতে চেয়েছিলেন যে এদের হাতেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। অথচ তিনি বলছিলেন নির্বাচনের স্বাধীনতার কথা।

এরপরের অনেক ঘটনায়ও এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে ইয়াহিয়া খান মনে করতেন যে পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকতে পারবেন। এ রকম একটা চাপা গুঞ্জন অন্ততঃ পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক মহল থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এটাকে আমরা শুভ লক্ষণ বলে মনে করতে পারিনি। '৬৯ সালে দু'বার ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। প্রথম বার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে। তখন বিশেষ কথাবার্তার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয়বার ১৯৭০ সালে বিজ্ঞান সম্মেলনে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যখন নিখিল পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন হয় তখন। সেটা উদ্বোধন করতে তিনি রাজী হয়েছিলেন। এবং তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার অবকাশ ঘটে। রাজনীতিক হিসাবে তিনি খুব বিচক্ষণ ছিলেন আমার মনে হয়নি। আমার ধারণা হয়েছিলো যে তিনি মনে করেন মিলিটারিতে যেমন কমান্ডার আদেশ দেওয়া মাত্র একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করার প্রশ্ন ওঠে না রাজনীতিতেও বোধ করি তাই।

রাজশাহীতে তাঁর আসার খবর শুনে ছাত্রেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করবে বলে স্থির করেছিলো। কারণ তখন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি ওঠে। ইয়াহিয়া খান রাজশাহী আসার মাত্র কয়েকদিন আগে ৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ফলে যে সমস্ত ছাত্র ইয়াহিয়া খানের উপর বিক্ষুব্ধ ছিলো তারাই তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসে। এবং বিজ্ঞান সম্মেলনের সময় ইয়াহিয়া খান বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়নি।

ভাইস চান্সেলর হিসাবে ইয়াহিয়া খান, গবর্নর আহসান এবং সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত যারা ছিলেন তাঁদের সবাইকে লাঞ্চে দাওয়াত করেছিলাম। তবে সেটা দুপুরে একটার পর। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় সকাল সাড়ে দশটায় তখন কিছুকাল বিশ্রামের জন্য ইয়াহিয়া খান ও গবর্নর আহসান ভাইস চান্সেলরের বাসায় আসেন। বিশুদ্ধ ডাবের পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করি। ডাব ওঁরা খেলেন কিন্তু কতক্ষণ পরই বললেন যে ওঁরা একবার রাজশাহী গ্যারিসন থেকে ঘুরে আসবেন। দু'ঘন্টা মাত্র হাতে সময় ছিলো। ওঁরা চলে গেলে কেউ কেউ বললেন যে শুধু ডাবের পানি খেয়ে ওঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি অন্য প্রকারের পানীয়ের প্রয়োজন তাঁদের ছিলো। লাঞ্চে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রিডার এবং বিজ্ঞান সম্মেলনের কর্মকর্তা সবাই উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহীর কমিশনার এবং ডিসিকেও ডেকেছিলাম।

লাঞ্চের সময় দুটো ব্যাপার নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিলো। প্রথমতঃ যে টেবিলে ইয়াহিয়া খান বসে খাবেন হোস্ট হিসাবে তার শীর্ষে ছিলো আমার স্থান। মিলিটারি সেক্রেটারী বললেন যে রাষ্ট্রের প্রধান যেখানে উপস্থিত থাকবেন, প্রটোকল মোতাবেক টেবিলের শীর্ষে তাঁরই বসবার অধিকার। এ সমস্যা সমাধান করতে কোনো অসুবিধা হলো না। কিন্তু যখন খাবার পরিবেশন করা হলো তখন প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারী আবার বললেন ইয়াহিয়া খান পোলাও খেতে পারবেন না। ডাক্তারের নিষেধ। মনে হলো যে মিলিটারি সেক্রেটারী এদিকে কড়া নজর রাখছেন। মহা মুসিবতে পড়া গেলো। রুটির কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না। উপর তলায় খোঁজ নিয়ে দেখলাম আমার ফ্যামিলি কোয়ার্টারেও পাউরুটি জাতীয় কিছু অবশিষ্ট ছিলো না। ইয়াহিয়া খান বললেন, কুছ পরওয়া নেহি। আমি অন্যান্য জিনিস দিয়েই লাঞ্চ সমাধা করবো। তিনি বেশীর ভাগ-রুই মাছের রেজালা খেলেন এবং এটা তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো। অক্টোবর মাসে যখন তাঁর সাথে শেষ দেখা হয় তখন তিনি এ মাছের রেজালার কথা উল্লেখ করেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। প্রেসিডেন্ট আমার দাওয়াত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে স্থানীয় সিভিল সার্জন আমার রান্না ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিলেই প্রেসিডেন্ট আমার রান্না খেতে পারবেন। তা ছাড়া পরিবেশনের আগে প্রত্যেকটি আইটেম সিভিল সার্জনকে চেখে দেখতে হবে। এসব ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো; কোনো অসুবিধা হয়নি।

আর একটি ছোট্ট ব্যাপারের কথা মনে আছে। খানা পরিবেশন করা হয় দুই কামরায়। যে কামরায় ইয়াহিয়া খান বসেছিলেন তাতে কয়েকটি টেবিল পাতা হয়েছিলো। প্রধান টেবিলে মাত্র ছ'জনের ব্যবস্থা করা হয়। রাজশাহীর কমিশনারকে অন্য এক টেবিলে বসাবার কথা ছিলো। শেষ মুহূর্তে আমাকে জানানো হয় যে, এটাও হবে প্রটোকলের খেলাপ। তখন প্রধান টেবিলে কমিশনারের বসবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইয়াহিয়া খান নিজে এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা প্রথমবারের মতো রাজশাহীতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই মতিহারের ক্যাম্পাস দেখে মুগ্ধ হন। ঢাকা করাচী বা লাহোরে এতো গাছপালার সমারোহ নেই বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যতটুকু হয়েছে তাতে আমার মনে এই বিশ্বাস হয় যে তিনি নির্ভর করতেন কয়েকজন মিলিটারি অফিসারের পরামর্শের উপর যাঁরা মনে করতেন যে গায়ের জোরে রাজনীতির সমস্যাও সমাধান করা যায়। আমার আরো সন্দেহ হয় যে এই কারণে মিলিটারি পঁচিশে মার্চের ক্র্যাকডাউনের আগে পূর্ব পাকিস্তানের কোন নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার মনে করেনি। মোনেম খাঁন, নূরুল আমিন, খাজা খায়ের উদ্দীন, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী এঁরা সবাই জীবিত ছিলেন কিন্তু মিলিটারি একবারও ভাবেনি যে ক্র্যাক ডাউনের মতো সাংঘাতিক একটি কর্মপন্থা অবলম্বনের আগে এদের কারো অভিমত জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

বরঞ্চ পরে, যেমন আমি আগেই বলেছি, এই নেতাদের সই আদায় করে মিলিটারির স্বপক্ষে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এরপরের পদক্ষেপটি আরো হাস্যকর। ক্র্যাক ডাউনের পরে মিলিটারি যখন উপলব্ধি করে যে রাজনীতিকদের সমর্থন ছাড়া তারা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হবে তখন প্রদেশের সর্বত্র পিস কমিটি কায়েম করা হয়। ব্যবস্থাটাকে আমি হাস্যকর বলছি এই কারণে যে বাস্তবিক পক্ষে পিস কমিটির হাতে সত্যিকার কোনো ক্ষমতা ছিলো না। ধরপাকড় অপারেশন সবকিছুই হতো মিলিটারির সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, অথচ মিলিটারি আশা করতো যে পিস কমিটি চোখ বুঁজে এ সবের সমর্থন যুগিয়ে যাবে।

মিলিটারি দেশে আরো তিন প্রকার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সৃষ্টি করে। এক দলের নাম ছিলো রাজাকার, দ্বিতীয় দলের নাম আলবদর এবং তৃতীয় দলের নাম আল-শামস। এদের বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দেওয়া হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রাজনীতিকদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। এ কথা সত্য যে বহু আদর্শবাদী যুবক যারা বুঝতে পেরেছিলো যে পূর্ব পাকিস্তানে যে সংঘর্ষ বেঁধেছে সেটা কোনো গৃহযুদ্ধ নয়, ভারতীয় আগ্রাসনের একটা দিক মাত্র, তারা এ সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা এগিয়ে এসেছিলো ভারতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। পুল, রাস্তা ব্যাংক, গুদাম, কল-কারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারা দেবার দায়িত্ব এদের উপর ন্যস্ত হয়। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এরা এ দায়িত্ব পালন করে। অনেকে বোমা এবং গুলিতে প্রাণ হারায়। কোনো কোনো স্থলে আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষে এদেরও গোলাগুলি ব্যবহার করতে হলে শত্রুপক্ষদের লোকও নিহত হয়। এবং এই কারণে তখন কোলকাতা থেকে প্রচার করা হয় যে স্বেচ্ছাসেবক তিনটি দলই আর্মির দালাল এবং এদের প্রধান কাজ হচ্ছে নৃশংসভাবে আওয়ামী লীগের সদস্যদের খতম করা। বিদ্রোহী বাহিনী যেমন অনবরত ব্যক্তিগত শত্রুতা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে বহু নিরীহ মানুষকে

নির্মমভাবে খুন করেছে তেমন কোনো বাড়াবাড়ি রাজাকাররা করেছে বলে আমরা তখন শুনিনি। তবে দুর্ঘটনা যে একবারে হয়নি সে কথা হলফ করে বলতে পারবো না। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের পর আওয়ামী লীগ এবং এর সমর্থকরা রাজাকারদের যেভাবে খুনী এবং ডাকাত বলে চিহ্নিত করেছিলো–যে অভিযোগ এখনও শুনছি তার কোনো ভিত্তি নেই। যে কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় সে হলো যে যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো তাদের লক্ষ্য ছিলো দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা। গৃহযুদ্ধের চরিত্রই এই যে যুদ্ধের শেষে যে পক্ষ জয়লাভ করে তারা তাদের শত্রুদের দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে। এ রকম ঘটনা স্পেনে হয়েছে। রিপাবলিকানরা হেরে গেলে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দল তাদের রাশিয়ার চর বলে অভিহিত করেছিলো। অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে যখন তিরিশের দশকে এই গৃহযুদ্ধ বাঁধে তখন ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স থেকে অনেক বামপন্থী লেখক রিপাবলিকান দলের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি স্টিফেন স্পেন্ডার (তিনি এখানো জীবিত আছেন) এবং ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েল। আবার অন্য দিকে যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রিপাবলিকানদের জয় হলে এখানেও কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে তারা ফ্রাঙ্কোর পক্ষ সমর্থন করেন। রয়ফুলার 'দ্য ফ্লাওয়ারিং রাইফেল' বা 'পুষ্পিত বন্দুক' এই নামে এক কবিতার বই প্রকাশ করেন। তাঁর বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিলো যে বন্দুক বা কামান দিয়ে রিপাবলিকানদের নিঃশেষ করা হচ্ছে তার থেকে আসলে পুষ্প বর্ষিত হয়। জর্জ অরওয়েল 'হমিজ টু ক্যাটালোনিয়া' নামক বইটিতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। তিনি অবশ্য খুব বিরক্ত এবং বিমর্ষ হয়ে স্পেন থেকে ফিরে আসেন। কারণ বাস্তববাদী অরওয়েল লক্ষ্য করেন যে ফ্রাঙ্কোর বাহিনী যেমন নৃশংসতার জন্য দায়ী তেমনি রিপাবলিকানরা এমন অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে যার সমর্থন কোনো বিবেকবান ব্যক্তি করতে পারে না।

গৃহযুদ্ধ–স্পেন ও নাইজেরিয়া

আসল কথা হচ্ছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ বা বাংলাদেশের '৭১ সালের সংঘর্ষের মতো দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন সমাজের সর্বত্র বিষ ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত পরিবেশ হিংসা এবং বর্বরতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

মজার কথা এই যে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর তাঁর দলকে স্পেনের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। বাংলাদেশে দেখছি নব্বই দশকেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে '৭১-এর হিংসা এবং বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। এ একটা কায়েমী স্বার্থের রূপ নিয়েছে। '৭১ সালে যারা বিজয়ী হয়েছিলো তারা কোনো মতেই

চাচ্ছে না যে দেশে সত্যিকার শান্তি ফিরে আসুক এবং তারা এ কথাও স্বীকার করবে না যে যারা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলো তারা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। দেশ প্রেমের একচেটিয়া অধিকার শুধু এক শ্রেণীর লোকেরই থাকতে পারে— এ এক উদ্ভট দাবী। আমেরিকায় ঊনিশ শতাব্দীতে যাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন যুদ্ধ করেন এখন আর তাদের দেশদ্রোহী বলা হয় না। বরঞ্চ যে জেনারেল লী'র অধীনে দক্ষিণের প্রদেশগুলো দাসত্বের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট লিংকনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেই জেনারেল লী আমেরিকার অন্যতম জাতীয় বীর হিসাবে স্বীকৃত এবং সম্মানিত।

আধুনিক কালের আফ্রিকার নাইজেরিয়াতে এ রকম আর একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। নাইজেরিয়ার ইবো সম্প্রদায় অধ্যুষিত বায়াফ্রা অঞ্চলটি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। তখন নাইজেরিয়ার গবর্নর জেনারেল ছিলেন গাওন। তিনি এক আশ্চর্য উদারতার নজির স্থাপন করেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরই ঘোষণা করেন যে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে নাইজেরিয়ার সব অধিবাসী যেনো দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে ইবোদের নিযুক্ত করা হয়। তার সুফল দাঁড়িয়েছে এই যে বর্তমানে নাইজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধজনিত হিংসা বিদ্বেষের লেশ মাত্র নেই।

বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে এই কারণে যে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র রক্ষার্থে যারা প্রতিবাদ করেছিলো তাদের সবাইকে এখনো অনেক মহলে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হচ্ছে। এটা অদৃষ্টেরই পরিহাস। এ অভিশাপের অবসান কবে ঘটবে বলা যায় না। কিন্তু এর মধ্যে যে অশুভ সম্ভাবনা নিহিত সে সম্বন্ধে সমাজকে সতর্ক হতে হবে। যদি কোনো রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তবে তাঁকে কি বলে আমরা সম্বোধন করবো? তিনি জয়ী হলে তিনি হবেন সত্যিকার দেশপ্রেমিক আবার হেরে গেলে চিরতরে দেশের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। ১৯৭১ সালের মতো ঘটনা ভবিষ্যতে যে আর কখনো ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কি? বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই যখন বাঙালী জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশের একমাত্র আদর্শ বলে প্রচার করা হয় তখনই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ শুরু হয়। এই অঞ্চলের আদিবাসী যে সমস্ত দল উপদল বাস করছে নৃতত্ত্ব ভাষা ধর্ম কালচার জীবন প্রণালী কোনো দিক দিয়েই বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল নেই। তারা যেভাবে পাকিস্তানে বসবাস করতো স্বাধীন বাংলাদেশ যদি তাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা না করতো তা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এ বিদ্রোহের কোনো হেতু সৃষ্টি হতো না। রাজা ত্রিদিব রায় এখনো পাকিস্তানে বসবাস করছেন এবং তিনি কিছুতেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৭৪ সাল থেকে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায় আপোষ করেননি।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে বাংলাদেশের হোমোজিনিয়িটি অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে অভিন্নতার যে চিত্র দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয় তার মূলে কোনো সত্য আছে বললে অনেক বাস্তবকে উপেক্ষা করা হয়। এ কথা সত্য যে এ অঞ্চলের ৯৫ ভাগ লোক বাংলায় কথা বলে যদিও তাদের মৌখিক ভাষা এক নয়। নোয়াখালী, চাটগাঁ, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের কথ্যভাষা ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকের পক্ষে বোঝা রীতিমত দুষ্কর। আমার মনে আছে যে ১৯৮৬ সালে এক সপ্তাহের মতো চট্টগ্রামবাসী এক বন্ধুর বাসায় ছিলাম। এক সঙ্গে খানাপিনা হতো। একদিন সকালে নাশতার টেবিলে তিনি তার ছেলেকে এমন দু'-একটি কথা বললেন যার এক বর্ণও আমি বুঝলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার ছেলেকে অন্য ভাষায় কিছু বললেন নাকি? ভদ্রলোক বললেন আমি চাটগাঁর কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছি মাত্র। এটা যে অবোধ্য তা আমার জানা ছিল না। সিলেট সম্পর্কেও আমার অভিজ্ঞতা ঐ রকমের। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আমি সিলেট এমসি কলেজে অধ্যাপনা করেছি। সিলেটিরা যখন ধীরে সুস্থে আমাদের সাথে কথা বলতো সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা না হলেও এরা নিজেদের মধ্যে যখন বাক্যালাপ করতো তার একটি শব্দও বোধগম্য হতো না।

এতো গেল আঞ্চলিক উপভাষার কথা। তবে অন্য প্রসঙ্গ উল্লেখের আগে এ কথা বলা দরকার যে, এককালে সিলেটি ভাষায় সাহিত্য চর্চা হতো সিলেটি নাগরী লিপিতে। এ রকম বই আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং সিলেটে থাকাকালীন ঐ লিপি পড়তেও শিখেছিলাম। এটা দেব নাগরী লিপির সরলীকৃত রূপ। যেমন এর মধ্যে দুটো 'ন' নেই, 'য' একটি, 'ব' একটি। ৎ বলে কিছু ছিলো না। তবে এখন বোধ হয় অনভ্যাসের জন্য তা আর পড়তে পারবো না। বয়স্ক সিলেটিরা এখনো সিলেটি নাগরীতে লেখা পুঁথির কথা বলতে পারবেন। আমার বিশ্বাস দেওয়ান আজরফ এসব পুঁথির কথা জানেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত উপজাতি বাস করে তারা অনেকগুলো ভাষায় কথা বলে, যার সঙ্গে শুনেছি বর্মী ভাষার মিল আছে। বাংলার নেই। তবে এ সমস্ত ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই। ময়মনসিংহ এর হাজং প্রভৃতি উপজাতি নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে সেটাও বাংলা নয়। তাছাড়া ঢাকায় এখনো এক সম্প্রদায় আছে যাদের আগে আমরা কুট্টি বলতাম, এরা এক ধরনের বিকৃত উর্দু বলে। এদের ছেলে মেয়েরা বেশ কিছুকাল যাবতই স্কুলে বাংলায় পড়াশুনা করছে এবং এখন তো উর্দুতে পড়াশুনা করার কোনো সুযোগই নেই। কিন্তু পরিবারের মধ্যে কথাবার্তা হয় উর্দুতে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ

এ সমস্ত উপজাতি বা উপদলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভাষা ভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। অন্যেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস না পেলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এই জাতীয়তাবাদ মেনে নিতে পারেনি। মানতে গেলে তাদের বৈশিষ্ট্য একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবং একাত্তরের পর নতুন সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে যে সংকটের সৃষ্টি করে তার জের আমাদের এখনো পোহাতে হচ্ছে এবং এখন তো এটা সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছে।

তাই বলছিলাম যদি ঘটনাচক্রে এ অঞ্চল সত্যি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যা হবে অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার-তখন এই বিদ্রোহীরা নতুন এক জাতীয়তাবাদের হোতা বলে পরিচিত হবে এবং আজ যাদের বিদ্রোহী বলা হচ্ছে তারাই তখন হবে জাতীয় বীর।

যারা এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা অহরহ বলে বেড়ায় মনে হয় তাদের ধারণা যে ইতিহাসের গতি '৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এসে থেমে গেছে। কিন্তু এ যে কত বড় মূর্খতা তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে হলে এমন একটি চেতনার প্রয়োজন যার মধ্যে '৭১-এর হিংসা বিদ্বেষের কোনো চিহ্ন বর্তমান থাকবে না। এবং যে চেতনায় এ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর অধিবাসী মিলিত হতে পারে। আজগুবি কোনো বিজাতীয় কালচারের ভূত দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে এই চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে যারা বসবাস করছে তাদের নিজস্ব জীবন ধারা, যার মধ্যে ধর্মের প্রতিফলন স্পষ্ট, অবলম্বন করেই একটি জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বলতে আমি এ কথা বলছি না যে এ রকম চেতনা এখন একেবারেই নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক নানা উদ্ভট থিওরি আউড়ে এটাকে এমন এক বিপথে চালনা করার চেষ্টা করছে যা আমাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী।

শিকড়ের কথা

শুনি কেউ কেউ বলেন, শিকড়ে ফিরে যাবার কথা। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ লেখক আলেক্স হেইলি তার নিজের পূর্ব পুরুষের খোঁজে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করেন যে প্রায় দু'শ বছর আগে যে একটি তরুণকে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস হিসাবে ধরে নিয়ে আসা হয় তিনি তারই বংশধর। এই তরুণটি ছিলো মুসলমান। হেইলি তাঁর এ কাহিনী যে পুস্তকে বর্ণনা করেছেন সেটা

উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য এবং এর নাম দিয়েছিলেন রুটস। তখন থেকে এই রুট বা উৎসের সন্ধান করা এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। আমার ধারণা বাংলাদেশে যারা শিকড়ের কথা বলেন, তাদের মনে হেইলির রুটস ছায়াপাত করেছে। কিন্তু এরা ভুলে যান যে বিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় কোনো আদিম আফ্রিকান কালচার প্রবর্তনের চেষ্টা হেইলি করেননি। তিনি একজন মার্কিন নাগরিক। মার্কিন সভ্যতার সবটাই তিনি গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক সমাজের একটা প্রাচীন ইতিহাস থাকে যার মধ্যে আলেক্স হেইলির মতো উৎসের সন্ধান করা যায়। অনেক জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাজার বা দু'হাজার বছর আগে তারা ছিলো একেবারে বর্বর। উৎসের সন্ধানে গিয়ে সেই বর্বরতায় ফিরে যেতে হবে? প্রাক ইসলামী যুগের বাঙালী সমাজের মধ্যে যদি বর্তমান বাংলাদেশের উৎসের সন্ধান করতে হয় তা হলে দেখা যাবে সেটা ছিলো আপেক্ষিকভাবে একটা বর্বর যুগ যখন এ অঞ্চলের অধিবাসীরা সভ্যতার অনেক কিছু সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। আমি দু'একটি ব্যাপার উল্লেখ করছি। সেই আদিম যুগে এ দেশের লোকেরা কি খেত আমি জানি না, তবে এ কথা সত্য যে মুসলমানী রান্না যাতে পেঁয়াজ, রসুন, এলাচি, দারচিনি ব্যবহৃত হয় যা এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত, তখন এ রকম রন্ধন প্রণালীর অস্তিত্ব ছিলো না। শিকড় বলতে কি আমরা সেই প্রাচীন যুগে ফিরে যাবো? শুনেছি একদল তরুণ নাকি ১লা বৈশাখের দিনে পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে শিকড়ে ফিরে যাওয়ার পরিতৃপ্তি লাভ করে। এটাকে এক ধরনের বুদ্ধি বিকৃতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

তারপর পোশাকের কথাই ধরা যাক। এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে সেলাই করা পোশাক ব্যবহারের রেওয়াজ ছিলো না। তারা দুখন্ড কাপড় গায়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করতো। পুরুষেরা একখন্ড কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখতো। আর মেয়েরা শুধু বুকটা ঢেকে রাখতো কাচুলি দিয়ে। যারা বিশ্বাস করে যে শিকড়ে ফিরে গিয়েই তাদের আত্মশুদ্ধি হবে তারা কি সেলাই করা জামাকাপড় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত? নীহার রঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাসে এই আদিম সমাজের পরিচয় আছে।

মুসলমানরা যেমন সভ্যতার বহু উপকরণ সঙ্গে নিয়ে আসেন তেমনি পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি যার সঙ্গে সেই আদিম কালচারের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা রীইনফোর্সট কংক্রীটের বাড়ীতে বাস করি, ঘরে আমাদের বিজলী বাতি। আরো আছে ফ্রিজ, রেডিও, টেলিভিশন। যে কাপড়, জুতা ব্যবহার করি তা তৈরি হয় মেশিনচালিত কারখানায়। চলাফেরা করি মটরে-বাসে। সফর করি যন্ত্রচালিত জাহাজে বা প্লেনে। এ রকম আরো অনেক জিনিসের উল্লেখ করা যায় যার উপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। শিকড়ে ফিরে যাওয়ার অর্থ তো হওয়া উচিত এ সব কিছু পরিত্যাগ করে কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ আহার্য ধারণ করে জীবন

যাপন করা। এমনকি ছাপাখানায় মুদ্রিত বই বা খবরের কাগজও আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। কাগজ কথাটি মুসলমানী শব্দ। আগে এ দেশের হিন্দু পন্ডিতেরা ভূর্জ্যপত্রে তাদের পুঁথি রচনা করতেন। ওটাই কি হবে আদর্শ?

আরো একটা কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের উৎসের সন্ধান করতে গেলে বল্লাল সেন যুগের অধিবাসীদের মধ্যে সে উৎস পাওয়া যাবে না। এই সমাজের মতো মিশ্র সমাজ খুব কমই আছে। এ কথা সত্য যে এ দেশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো; কিন্তু ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবৈষম্য উঠে যাওয়ার ফলে এদের রক্তের সঙ্গে আরব ইরানী তুর্কী পাঠান ইত্যাদি বহু রকমের রক্ত মিশ্রিত হয়। এখনো বহু মুসলমান পরিবার আছেন যারা কুর্সিনামা দেখে বলতে পারবেন তাদের পূর্ব পুরুষ কোন শতাব্দীতে এ দেশের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। এ সমস্ত প্রাচীন পরিবারের রক্তের মধ্যেও স্থানীয় রক্ত নিশ্চয়ই মিশেছে। সুতরাং শিকড় বলতে যারা একটা বিশেষ অর্থে প্রাক-ইসলামী যুগের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করছেন তাঁরা তো একটা সম্পূর্ণ বাস্তব বর্জিত স্বপ্নকে সত্য বলে মেনে নিতে বলছেন। পদ্মা মেঘনা যমুনার মাছ যেমন এখানে সবাই খায় তেমনি যে সমস্ত বস্তু বা অভ্যাস বিভিন্ন যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা রপ্ত করেছি তাও আমাদের সভ্যতার অঙ্গ।

শিকড় তত্ত্বের সমর্থকরা কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করেন, আর কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিতে বুঝাতে চান যে ইসলাম না এলে বাঙালীর ভাগ্যে নাকি কোনো বিড়ম্বনা ঘটতো না। এটা একটা আশ্চর্য 'থিওরি' বটে। প্রাচীন আচার পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে এদের নরবলি এবং সতীদাহ প্রথাও আবার প্রচলন করা প্রয়োজন হবে। উনিশ শতাব্দীর শেষ অবধি পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। ইংরেজরা সতীদাহ দমন করার উদ্যোগ নিলে ব্রাহ্মণরা আপত্তি জানিয়েছিলো এই বলে যে সরকার অন্যায়ভাবে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন। বঙ্কিম চন্দ্রের কপালকুন্ডলা উপন্যাসের কাপালিকের সাধনার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে নরবলির কথা আছে। এটাও তো একটা আদিম সংস্কার। এই কালচারে কি আমাদের ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে?

শুধু এখানেই শেষ হবার নয়। যারা দাবী করে যে তাদের পূর্ব পুরুষ যে ধর্মে এবং কালচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলো সেই ধর্ম এবং কালচারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তাদের একান্ত কর্তব্য তারা কি এ কথা ভুলে যায় যে অধিকাংশ হিন্দু যারা সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তারা মুসলিম সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। পাঠান বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দেয়। যদি আজ ইসলাম থেকে সরে দাঁড়িয়ে শিকড়ে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে তবে জাতিভেদের প্রথাও তো আবার পুনঃপ্রবর্তিত হতে হবে। আর এ সমস্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তি আবার অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে।

আসল কথা, যারা এ সমস্ত কথা বলে এবং এ জিনিস শুরু হয়েছে ষাটের দশক থেকেই—তারা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের মতলবে এ সমস্ত থিওরি আওড়ায়। ১৯৪৭ সালের বিভক্তি এরা মানতে রাজী নয়। এবং এ অঞ্চল স্বাধীন থাকুক এটাও তারা চায় না। পাকিস্তান আমলে এরা অনবরত প্রচার করেছে যে এখন আমরা পাঞ্জাবীদের অধীন। এবং পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এলে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারবো। আবার এখন বলছে যে '৭১ সালে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তারো কোনো মূল্য নেই। ওপার বাংলার সঙ্গে মিশে গেলেই নাকি আমরা সত্যি মুক্ত হবো।

'৭১ সালে ভারতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে বলা হতো না। কারণ ও কথা বললে এ দেশের জনসমাজ সাড়া দিতো না। তাই তখন বলা হচ্ছিলো যে ভারত আমাদের প্রকৃত বন্ধু। ভারতীয় সৈন্য এসে আমাদের রক্ষা করবে। ভারতে বাঙালী পাঞ্জাবী মারাঠা তামিল শিখ পার্সি বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী লোকেরা এক রাষ্ট্র গঠন করে বসবাস করতে পারে। তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি লক্ষিত হয়নি। কিন্তু পাকিস্তানে পাঞ্জাবী পাঠান সিন্ধি এবং বাঙালী এক রাষ্ট্র গঠন করে এমন একটি কর্ম করেছিলো যা শুধু হাস্যকরই নয়, রীতিমত এ্যাবসার্ড অর্থাৎ অযৌক্তিক। এই যুক্তিটি চিরকালই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। ভারতে প্রধান ধর্ম হচ্ছে হিন্দুত্ব। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের মারাঠা এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া আর কোনো বন্ধন নেই। এই ধর্মও ইসলামের মতো ধর্ম নয়। উত্তর ভারতের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় আচরণের প্রভেদ অনেক। মুসলমান বলতে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে সে ব্যক্তি এক আল্লাহ এবং রসুলে বিশ্বাস করে সে রকম কোনো সর্বগ্রাহ্য বিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যে নেই। তবু অহর্নিশ আমাদের বলা হয়েছে যে কায়েদে আজম জিন্নাহ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নাকি পূর্বাঞ্চলকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করেছিলেন। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক যারা আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিলাম, আইন সভার সদস্য যাঁরা ৪৭ সালে ভোট দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলাম এরা যেনো রাতারাতি হয়ে গেলেন দেশদ্রোহী এবং সমাজদ্রোহী। এ সমস্ত কথা ভেবে '৭১ সালে যেমন মনঃপীড়া অনুভব করেছি এখনো করি। কিন্তু '৭১ সালের ২৫ মার্চের পর অধিকাংশ লোকই আওয়ামী লীগের প্রচারণা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল।